ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1346-1354
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.355

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ

সায়ন সরকার, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath Tagore was not a conventional political thinker, but his ideas about the nation and his motherland are reflected in his various writings. Rabindranath took an active role in politics during the first Partition of Bengal and despite being a leading proponent of constructive swadeshi or '*Atmashakti*', he later distanced himself from mainstream politics. After that, he expressed his thoughts on the various political upheavals happening in the country. There were some ideological agreements and disagreements between Tagore and Gandhi, who was the central figure of India's freedom movement. But Tagore still accepted Gandhi as a true national leader. This helps us understand an important aspect of Tagore's idea of the nation. It further explains what Tagore meant by 'nation', why he believed that in India society was more important than the concept of a nation-state, and what '*Swadesh*' meant to him. His criticism of western nationalism and his warning about the 'terrible dangers' hidden within it are major elements of his political thought. His views on 'Patriotism' and his thoughts on his homeland are expressed in his literary works. Tagore's voice often carried the message of universal brotherhood, and his political thinking reflected a deep sense of internationalism. In essence, this article tries to explore Tagore's patriotic identity– someone who was critical of aggressive or narrow forms of nationalism, but deeply devoted to his motherland, and for whom the well-being of all human beings came first.

Keywords: Rabindranath, Motherland, Patriotism, India, Nationalism, Human beings

প্রকৃত বা কঠোর অর্থে রাজনৈতিক চিন্তাবিদ বলতে যা সাধারণত আমরা বুঝে থাকি রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এমন একজন ব্যক্তি যার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে দিয়ে তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে; তবে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কিত তাঁর রচিত বিভিন্ন রচনা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিকে লেখা তাঁর চিঠি পত্রের মধ্যে দিয়ে আমরা অত্যন্ত সচেতন একজন স্বদেশপ্রেমী মানুষকে আবিষ্কার করতে পারি যার প্রাণ দেশমাতৃকার জন্য চিরদিন নিয়োজিত ছিল। তাঁর লেখা 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্টনৈতিক মত' প্রবন্ধে তিনি নিজেই তাঁর রাষ্ট্র চিন্তা সম্পর্কে লিখেছেন যে,

> "বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের নানা অবস্থা এবং আমার নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল আমি চিন্তা করেছি এবং কাজও করেছি।...যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সঙ্গত।...রাষ্ট্রনীতির মতো বিষয়ে কোনো বাঁধা মত একেবারে সুসম্পূর্ণভাবে কোনো এক বিশেষ সময়ে আমার মন থেকে উৎপন্ন হয়নি– জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নানা পরিবর্তনের মধ্যে তারা গড়ে উঠেছে। সেই

> সমস্ত পরিবর্তন-পরম্পরার মধ্যে নিঃসন্দেহ একটা ঐক্যসূত্র আছে । সেইটিকে উদ্ধার করতে হলে রচনার কোন্ অংশ মুখ্য, কোন্ অংশ গৌণ, কোনটা তৎসাময়িক, কোনটা বিশেষ সময়ের সীমাকে অতিক্রম করে প্রবাহমান, সেইটে বিচার করে দেখা চাই। বস্তুত সেটাকে অংশে অংশে বিচার করতে গেলে পাওয়া যায় না, সমগ্রভাবে অনুভব করে তবে তাকে পাই।"[১]

যে কোন ব্যক্তিকে তাঁর সমসাময়িক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা গভীরভাবে প্রভাবিত করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন তাঁর মননে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাইতো তাঁর সমসাময়িককালে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে তিনি তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই মহান ভারতীয় কবি, দার্শনিক এবং শিক্ষাবিদ ছিলেন একজন প্রবল মানবতাবাদী। তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর এই মানবতাবাদী চিন্তাধারা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে। মূলত মানুষের কল্যাণই তাঁর কাছে প্রধান ছিল। অধ্যাপক গৌতম নিয়োগীর মতে,"...বৃহৎ মানুষের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন প্রকৃত ভারতীয় পথ। বাইরের প্রভেদ দূর করে অন্তরের এক মানব– তার বিশ্বমানসলোক।"[২]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বিষয়ে লেখালেখির শুরু ১৮৮০ সাল থেকে। 'সাধনা' পত্রিকায় রাষ্ট্রীয় বিষয়ে তিনি প্রথম আলোচনা করেন। সদ্য গড়ে ওঠা জাতীয় কংগ্রেস এর সম্পর্কে তাঁর গভীর আগ্রহ ও মনোযোগ, জাতীয় সম্মেলনগুলিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। কিন্তু কংগ্রেসের কাজকর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে তেমন অনুরাগ ছিল না, বরং বীতরাগের মাত্রাই ছিল প্রবল। রবীন্দ্রনাথ এই সময়কাল থেকে তাঁর অসংখ্য রচনায় কংগ্রেস নরমপন্থী নেতাদের এবং তাদের ভিক্ষাবৃত্তির পদ্ধতিকে চরম সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, এই সময় রাজনীতির সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোনো সংযোগ ছিল না। নেতৃবর্গ বিদেশি আদবকায়দায়, বিদেশি রীতি পদ্ধতি অনুযায়ী, বিদেশি ভাষায় জনসাধারণকে তাঁদের কথাবার্তা শোনাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু জনগণের তাতে কোনো উৎসাহ ছিল না। তিনি কংগ্রেসি নরমপন্থী নেতাদের পোশাকি আচরণের বিলেতপ্রীতি মানতে পারেননি।[৩] তিনি ১৮৯৭ সালে নাটোরের কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশন বাংলা ভাষায় চালানোর জন্য তরুণদের উদ্দীপিত করেন। ১৯০৮ সালে পাবনায় কংগ্রেসের সভায় সভাপতির ভাষণ রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলায় দিয়েছিলেন। যদিও এর জন্য কংগ্রেসের নেতারা ব্যঙ্গ করেছিলেন কবিকে।

১৯০৫ সালে প্রথম বঙ্গভঙ্গের সময় রবীন্দ্রনাথের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় আসে। এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে স্বদেশী আন্দোলন হয়েছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের অংশগ্রহণ এই আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করে তোলে। স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়েছিল বয়কট কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে। অরবিন্দ ঘোষ হাজির করেছিলেন বিলেতি পণ্য, সরকারি শিক্ষা, বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজকর্মে বয়কটের কর্মসূচি। এই বয়কট কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে স্বদেশী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে বঙ্গ বিভাজন বাংলাকে দুর্বল করে দেবে। তিনি মনে করতেন সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হলে বহিরাগত কোন শক্তি বাংলাকে দুর্বল করতে পারত না, ঠিক যেমনি একজন সুস্থ ব্যক্তিকে রোগ কাবু করতে পারে না। একটা শক্তিশালী সমাজই হিন্দু এবং মুসলিমদের মধ্যেকার সম্প্রীতিকে নিশ্চিত করতে পারে, যা ভারতের বহুত্ববাদ রক্ষা করার জন্য অপরিহার্য।[৪] তাই দেশবাসীর মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগ্রত করার জন্য এই সময়কালে রবীন্দ্রনাথ লিখে ফেললেন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল', 'আমার সোনার বাংলা' এর মতো স্বদেশী সংগীত। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় রাখিবন্ধনের দিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য যে হিন্দু-মুসলিম সম্মিলিত শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে 'বাংলার মাটি , বাংলার জল' গানটি গাওয়া হয়।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনকে ইতিহাসবিদ সুমিত সরকার তাঁর 'দ্য স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল' গ্রন্থে নরমপন্থী ধারা, গঠনমূলক স্বদেশী (আত্মশক্তি), রাজনৈতিক চরমপন্থা (নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ) এবং বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ– এই চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরমধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালি জাতির আত্মশক্তি বা গঠনমূলক স্বদেশী আন্দোলনের প্রবক্তা; তাঁর মতে, স্বদেশী তাঁতে তৈরি কাপড়, হাতে তৈরি শিল্পদ্রব্যের ব্যবহার, গ্রামীণ পঞ্চায়েতে বিচার, মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বদেশী বিদ্যালয়ে শিক্ষা, সমবায় ব্যাংক, কৃষি খামার স্থাপন প্রভৃতি ছিল 'আত্মশক্তি'। সুমিত সরকারের মতে, এই সময় বাংলায় যে নতুন চেতনার বিকাশ ঘটেছিল তার সবচেয়ে স্পষ্ট এবং স্মরণীয় প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে দিয়ে।[৫] তিনি 'মানসী' কাব্যগ্রন্থে যে কবিতাগুলি লিখেছিলেন সেখানে চিরাচরিত রাজনৈতিক আন্দোলনের পদ্ধতি থেকে সরে এসে অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। ১৯০৪ সালে 'স্বদেশী সমাজ' নামক প্রবন্ধে এই বিষয়টি আরো বিস্তারিত করেন। এই স্বদেশী সমাজের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তবে রবীন্দ্রনাথের এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর এই ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছিল, যদিও পরবর্তীকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য গুলির পূর্বাভাস এর মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায়।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিতে ঢুকে পড়লেও পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে এর থেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। এর কারণ হয়তো ছিল তাঁর গঠনমূলক স্বদেশীর বিরুদ্ধে অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র এর মতো নেতাদের বিভিন্ন লেখনী। সে যাই হোক, এর পরে প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে না থাকলেও দেশের বিভিন্ন সংকটে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নানা বিষয়ে, দেশবাসীর নানা প্রয়োজনে তাঁর কলম সর্বদা এগিয়ে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন না, এই ধরনের রাজনীতি তাঁর পচ্ছন্দ ছিল না। 'ঘরে-বাইরে', 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। তরুণ বিপ্লবীদের আত্মবলিদানকে শ্রদ্ধা জানালেও তিনি তাদের অবলম্বন করা পদ্ধতিকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি। তা সত্ত্বেও তাদের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাই তো সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থক না হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাকে 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্তি' বলে সম্বোধন করেন। আবার পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র বসুকে 'দেশনায়ক' হিসেবে বরণ করে লিখেছিলেন 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ, উৎসর্গ করেছিলেন 'তাসের দেশ' নাটিকাটি। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'নাইটহুড' উপাধি ত্যাগ করেন।

ইতিমধ্যে ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর আর্বিভাব ঘটে গিয়েছে। বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক প্রমথনাথ বিশী 'রবীন্দ্র সাহিত্যে গান্ধী চরিত্রের পূর্বাভাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতার আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন যে, গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর ন্যায় এক প্রতিরূপ নির্মাণ করেছিলেন। প্রবন্ধের একেবারে প্রারম্ভে তিনি লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট "মহামানবের কাল্পনিক আভাসের সঙ্গে এযুগের একজন মহামানবের বাস্তব রূপের অপ্রত্যাশিত সাদৃশ্য দেখিতে পাইব। সেই বাস্তব – মহামানব গান্ধী। গান্ধীর নামটিও জানিবার আগে রবীন্দ্রনাথ আভাসে গান্ধী চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন।"[৬] এই প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথের ১৮৮৮ সালে রচিত 'গুরুগোবিন্দ' কবিতাটির উল্লেখ করে লিখেছেন, "বস্তুত কবির কাছে গুরুগোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ একজন মহামানবের চিত্র আঁকিতেছিলেন এবং সে অঙ্কনপ্রয়াসের মূলে ছিল তাঁহার কালের বেদনা ও আকাঙ্খা–

"আমার জীবনে লভিয়া জীবন
জাগ রে সকল দেশ।"

ইহা গুরুগোবিন্দ সিংহের পক্ষে আকাঙ্ক্ষা, কবির পক্ষে কল্পনা, কিন্তু গান্ধীজীর পক্ষে ইহা বাস্তব সত্য, এবং তাহা আমাদের চোখের উপরেই এমন ভাবে ঘটিয়া গিয়াছে যে, ভারতবর্ষের আর কোনো মহামানব নিজের জীবনকালে এমন সার্থক দাবি করিতে পারেন নাই।"[৭] এই প্রবন্ধে প্রমথনাথ বিশীর দেওয়া বিভিন্ন উদাহরণ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে গান্ধীজীর জীবন, কর্ম ও বাণীর সার্থক পূর্বাভাস রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সাহিত্য কর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল যখন "গান্ধীজির নাম তখন তাঁহার পরিবারের বাহিরে কে জানিত?"[৮]

রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীজীর মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য ও অনৈক্য দুই-ই ছিল। তাঁরা দুজনেই আশ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমর্থক ছিলেন, যেখানে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ পেতে পারত। দুজনেই জাতপাত এবং অস্পৃশ্যতার তীব্র বিরোধী ছিলেন এবং এবং দুজনেই ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ। গান্ধীজি বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা লাভের আগে দেশবাসীকে সেটা রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলা আবশ্যক। তাঁর কাছে ভারতের জনসাধারণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়ন সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও সাধারণ মানুষের প্রকৃত বিকাশ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। 'লোকহিত' রবীন্দ্রনাথ এসম্পর্কে বিশদে আলোচনা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর অন্যতম অবলম্বন ছিল তাঁর সত্যাগ্রহ পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সত্যাগ্রহকে পূর্ণ সমর্থন করতেন। একইভাবে গান্ধীজীর অহিংসা নীতির প্রতিও রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সমর্থন ছিল। পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রেও তাদের চিন্তা ভাবনা ছিল একই ধরনের। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকা কাটা ব্রতকে, তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে, তাঁর প্রতি দেশবাসীর অন্ধ আনুগত্যকে এবং তাঁর অনশনের পন্থাকে কখনো সমর্থন করতে পারেননি। গান্ধীজীর অহিংসার তত্ত্বকে পূর্ণ সমর্থন জানালেও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্বন্ধে তাঁর মনে নানা দ্বিধা ছিল। তবুও রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন গান্ধীই ভারতের প্রকৃত জননেতা। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "...মহাত্মা গান্ধি এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহুকোটি গরিবের দ্বারে-- তাদেরই আপন বেশে, এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন, তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই। এইজন্যে তাঁকে যে মহাত্মা নাম দেওয়া হয়েছে এ তাঁর সত্য নাম। কেননা, ভারতের এত মানুষকে আপনার আত্মীয় করে আর কে দেখেছে।"[৯]

এবার আসা যাক রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র তথা স্বদেশ ভাবনা এবং দেশপ্রেম সম্মন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনায়। ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন। একটি হল 'নেশন কী?' এবং দ্বিতীয়টি 'ভারতবর্ষীয় সমাজ'। এই দুটি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চাইলেন এ দেশে 'নেশন' নয়, সমাজ-ই প্রধান। 'নেশন' বলে কোন বস্তু আমাদের ঐতিহ্য ছিল না।[১০] রাজদণ্ড লাভের জন্য জাতিদের মধ্যে হানাহানি সময়ও সমাজই দেশের ধর্মকে রক্ষা করতে পেরেছিল। 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "... আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যায় নাই...সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।"[১১]

রবীন্দ্রনাথের বহু ব্যবহৃত 'স্বদেশ' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী? এই সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথের 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধটির কিছু বক্তব্য তুলে ধরেছেন।[১২] সেখানে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমার দেশ আছে এই আস্তিকতার একটি সাধনা আছে। দেশে জন্মগ্রহণ করেছি বলেই দেশ আমার, এ হচ্ছে সেই-সব প্রাণীর কথা যারা বিশ্বের বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে পরাসক্ত। কিন্তু,যেহেতু মানুষের যথার্থ স্বরূপ হচ্ছে তার আত্মশক্তিসম্পন্ন অন্তরপ্রকৃতিতে, এই জন্য যে দেশকে মানুষ আপনার জ্ঞানে বুদ্ধিতে প্রেমে কর্মে সৃষ্টি করে তোলে সেই দেশই তার স্বদেশ।"[১৩] পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটির ভেতর তার নেশন-চিন্তার রহস্য লুকিয়ে আছে।"[১৪] অনুরাধা রায় মনে করেন, রবীন্দ্রনাথের "আত্মশক্তির আদর্শে এক হয়ে যায় ব্যক্তির মুক্তি আর দেশের মুক্তি। আরো বড়ো করে দেখলে, ব্যক্তির মুক্তি আর সার্বজনিক মুক্তি।.. এই আত্মশক্তির অনুবন্ধী মন্ত্র হল মানুষ বাঁধা। দুটি আদর্শ বা মূল্যবোধই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।"[১৫] তিনি আরো মনে করেন, "এই আত্মশক্তি আর মানুষ বাধা মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে সৃজনশীল স্বদেশ চিন্তা তা যেন অ্যান্ডারসনের জাতি তত্ত্বের সঙ্গে বেশ সুসঙ্গত।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথমদিককার কিছু লেখাতে 'প্যাট্রিয়টিজম' ও 'নেশনতন্ত্র' কে সমার্থক শব্দ হিসেবেই দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্যাট্রিয়ট বলে পরিচয় দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। ১৯২১ সালে এন্ড্রুজকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, তিনি তাঁর ভারতকে ভালোবাসেন, কিন্তু তাঁর ভারত একটা ভাবনা, কোনো ভৌগোলিক অভিব্যক্তি নয়। তাই তিনি 'প্যাট্রিয়ট' নয়; তিনি সারাবিশ্বে তাঁর স্বদেশিদের খুঁজতে চান।[১৭] যদিও সেই সময় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে প্যাট্রিয়ট বলে স্বীকার না করলেও, সমসাময়িককালে ন্যাশনালিজম ও প্যাট্রিয়টিজম এর মধ্যে যে ধারণাগত পার্থক্য করা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে অবশ্যই প্যাট্রিয়ট বলে অভিহিত করতে হয়। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ এর মতে, "রবীন্দ্রনাথ দেশের ভূখণ্ডের ওপর কোন দেবত্ব আরোপ করতে চাননি, দেশ মাতৃকার প্রতি যুক্তিহীন অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করেননি। তিনি বিশ্ব মানবিকতার প্রতি আস্থা রেখে স্বদেশের মঙ্গল চেয়েছেন। মানুষের অপমান তাঁকে আহত করেছে, ভারতীয় মানুষ বলে আলাদা কোন অনুভূতির কথা কবি বলেন না।"[১৮]

রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'ন্যাশনালিজম' গ্রন্থটি। মূলত এটি হলো প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় জাপানে ও আমেরিকায় ভ্রমণ কালে ওই দুই দেশে দেওয়া তিনটি বক্তৃতার সংকলন।[১৯] বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইউরোপের কিছু দেশে উগ্র, জঙ্গি ও আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষার উদ্ভবের পটভূমিতে জাতীয়তাবাদের উপর তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তিনি ইউরোপের সেই সমস্ত দেশে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির ফসল হিসেবে জাতীয়তাবাদের ধারণার জন্মকে ব্যাখ্যা করেছেন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> "সত্য কথাটি হ'ল পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবোধের উৎসমূলে এবং কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সংঘাত ও জয়ের প্রবল ইচ্ছা; সামাজিক সহযোগিতা এর ভিত্তি নয়। পশ্চিমী জাতীয়তাবোধ ক্ষমতার সুষ্ঠু সংগঠন গড়ে তুলেছে, কিন্তু কোন আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ গড়ে তোলেনি। এই জাতীয়তাবাদ লুণ্ঠনকারী জীবের মতো, যার সব সময় কোন-না-কোন বধ্য শিকারের প্রয়োজন।"[২০]

আবার, 'ন্যাশনালিজম ইন ইন্ডিয়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন,

> "ভারতবর্ষে সত্যিকারের 'ন্যাশনালিজম' এর চেতনা কখনো ছিল না। যদিও শৈশব কাল থেকে আমাদের শেখানো হয়েছে যে, 'নেশন' এর প্রতিমূর্তি ঈশ্বর বা মানবতার প্রতি শ্রদ্ধার চাইতেও মহৎ, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমি সে-শিক্ষা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এবং এটা আমার

> প্রবল বিশ্বাস,আমার স্বদেশবাসী সংগ্রাম করে মানবতার আদর্শ থেকে স্বদেশের মূর্তি বড় এই ধারণা ত্যাগ করে লাভবান হবে।"[২১]

সমাজতত্ত্ববিদ আশিস নন্দী এ প্রসঙ্গে মনে করেন যে, যদি কোন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও নেশন-স্টেটের নীতিগুলিকে সর্বজনীন বলে ভাবেন তাহলে তিনি নিজের অজান্তেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনার বিরুদ্ধে অবস্থান করছেন।[২২]

রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন যে পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের আদর্শ স্বাধীনতা এবং মানবিক মূল্যবোধগুলিকে ধ্বংস করে দেয়, যার সাথে ভারতীয় ঐতিহ্যের এক গভীর বিরোধ আছে। অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় ঘোষ রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী আদর্শের মূল্যায়নে লিখেছেন যে,

> "জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাহলে একটি জাতিকে মুক্ত করতে পারেনা, বৃহত্তর মনুষ্যত্বের চর্চা করতে শেখায় না, কেবল অন্ধ রাষ্ট্রপ্রীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে। অতএব এই লুণ্ঠনকারী জাতীয়তাবাদ সামরিক সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের জনক, সহযোগিতানির্ভর, বিশ্বশান্তির পথে সহায়ক সমাজ তৈরি করে না। তাই জাতীয়তাবাদ সভ্যতার পরিপন্থী।"[২৩]

সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে 'জাতীয়তাবাদ হল এক ভয়াবহ বিপদ'।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাকে সঠিকভাবে বোঝার জন্য তাঁর মৌলিক সাহিত্যগুলিকেও বিশ্লেষণ করতে হয়। তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে রচিত একটি ত্রিকোণ প্রেমের গল্প। উপন্যাসটিতে রবীন্দ্র আত্মার দোসর নিখিলেশের বক্তব্য তথা নানা ভাবনার মধ্যে দিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনাকে উপলব্ধি করতে পারি। এখানে নিখিলেশ বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও বিলেতি কাপড় পোড়াবার আন্দোলনকে সমর্থন করে না। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে আমরা দেখি গোরা চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথের ভারত ভাবনার বাহক। এই উপন্যাসে ভারতীয় সমাজের বর্ণ বৈষম্য, জাতিভেদ প্রথা, জনসাধারণের দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের স্বরূপকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। তাঁর ভারত ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে গোরার বিভিন্ন বক্তব্যে। ভারতবর্ষের বহুত্ববাদকে বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ গোরার মধ্যে দিয়ে বললেন,

> "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই– যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না– যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।"[২৪]

একইভাবে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত প্রেম আর স্বদেশপ্রেমের টানাপোড়েনের চিত্র অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আশিস নন্দী রবীন্দ্রনাথের এই উপন্যাস ত্রয়ীর মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা ও সত্তার গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক সূত্র বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে,"তিনটি উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এক সুরে বাঁধা; এই চিন্তাধারা তিনটি উপন্যাসের রচনাকালের পঁচিশ বছরে এতটুকু পরিবর্তন হয়নি।"[২৫] এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের 'সংস্কার', 'বদনাম', 'ঘোড়া', 'কর্তার ভূত' প্রভৃতি ছোট গল্প, 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মুক্তধারা' প্রভৃতি নাটকে আমরা তাঁর স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেমের স্বরূপ বিভিন্নভাবে আবিষ্কার করতে পারি। একইভাবে এই বিষয়ে রয়েছে তাঁর লেখা অজস্র গান, কবিতা এবং প্রবন্ধ, যেগুলির কথা আলাদা করে উল্লেখের প্রয়োজন নেই বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম কখনো তাঁর সরাসরি বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে, কখনোবা আবার পরোক্ষে। প্রাশ্চাত্য সভ্যতার শিল্প-সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। যদিও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তিনি বরাবরই সোচ্চার হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন সেখানে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে তার স্বদেশ সমস্যার নানাদিক উঠে এসেছে। যেমন- রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্রনাথকে উদ্দীপ্ত

করেছিল। তাঁর রাশিয়ার চিঠিতে সে কথাই তিনি বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেশ গড়ার কাজে শিক্ষাকে বারবার গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাবনায় শিক্ষা হবে জীবন ভিত্তিক, যাতে দেশ গড়ার কাজটি সহজ হয়। রাশিয়ার চিঠিতে আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথের লেখায় উঠে এসেছে সেখানকার শিক্ষার কথা, গ্রামোন্নয়নের কথা, চাষী ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দময় জীবনের কথা। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ভাবনায় যে বিষয়টি মূলত প্রধান ছিল বা তার বিভিন্ন লেখায় বার বার এসেছে তা হল মানুষের কথা। তাঁর মতে, মানুষের সমাজ যদি গঠিত না হয় তাহলে সমাজ, দেশ সমস্ত কিছুই অর্থহীন হয়ে যায়, আর স্বাধীনতা তো বটেই।

রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তবে তিনি ছিলেন একজন নিখাদ দেশপ্রেমী মানুষ। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমকে যদিও অনেকে একই মনে করে, তবুও স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ এই দুটি শব্দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য অবশ্যই আছে। রজার স্ক্রুটন এর মতে স্বদেশপ্রেম হল এক ধরনের সংলগ্নতার অনুভূতি, অন্যদিকে জাতীয়তাবাদ হল এক ধরনের মতাদর্শ যা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তার কাছে জাতীয়তাবাদ একটি ভাবাদর্শ এবং স্বদেশপ্রেম হলো স্বাভাবিক অনুভূতি।[২৬] আশিস নন্দীর মতে, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটা ভাবাদর্শ হিসাবে এবং জাতীয়তাবাদের তত্ত্বটিকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি চাইছিলেন স্বদেশপ্রেমকে জাতীয়তাবাদের থেকে আলাদা করে নিতে।[২৭] যদিও তাঁর কাছে সবার উপরে ছিল মানবতাবাদ। রবীন্দ্রনাথের রচনায় মানুষের কথা বারে বারে এসেছে। ১৯০৮ সালে তিনি এ এম বোস কে লেখা চিঠিতে এ বিষয়ে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে লিখেছেন,

> "দৈশিকতা (প্যাট্রিয়াটিজম) আমাদের আত্মাকে চরম আশ্রয় দিতে পারবে না, আমি মনুষ্যত্বকে বরণ করে নিয়েছি – আমি হীরের মূল্যে কাচ কিনব না দৈশিকতা যে মনুষ্যত্বকে লঙ্ঘন করবে, এতো আমি আমার জীবনে ঘটতে দিতে পারব না।"[২৮]

এ বিষয়ে তাঁর 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে অনেক কথা আছে। সেখানে রবীন্দ্র আত্মার দোসর নিখিল তার স্বমতে অবিচল –

> "দেশের সেবা আমি করতে চাই, কিন্তু আমার পূজা তোলা থাকবে দেশের চেয়ে অনেক বড়। কে দেবতা বলে পুজো করলে তার ওপরেই অভিশাপ নেমে আসে।"[২৯]

সমসাময়িককালের ভারতে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদীদের গর্জন তীব্রতর হচ্ছে, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সম্পর্কে এই ভাবনা গুলিকে আমাদের পাথেয় করে তুলতে হবে।

আমরা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ও দেশপ্রেম সম্পর্কে আলোচনা করছি বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবকে কোনো ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে আটকে রাখা সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যে আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের সুর। তাঁর মতে,

> "...প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অঙ্গ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সদুত্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে...বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন— ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ষ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না।"[৩০]

বস্তুত রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে নিজেকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি লেখেন,

> "বিশ্বধর্মের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পারলেই আমরা বস্তুত স্বাধীন হই। স্বাধীনতার নিয়মই তাই। আমি স্বেচ্ছায় বিশ্বের সঙ্গে যোগ না দিই যদি, তা হলেই বিশ্ব আমার প্রতি জবরদস্তি করে আমাকে তার অনুগত করবে– তখন আমার আনন্দ থাকবে না, গৌরব থাকবে না, তখন দাসের মতো সংসারের কানমলা খাব।"[৩১]

বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ছিন্ন করে আমাদের বিশ্ববাসী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানবের স্বদেশ চিন্তা ও দেশপ্রেমকে কোন নির্দিষ্ট ধাঁচ মেনে আলোচনা করা প্রায় অসম্ভব, সে চেষ্টা এখানে করাও হয়নি, একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। তবে সামগ্রিক একটা আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদের বিরোধী কিন্তু দেশপ্রেমী মানুষ। আবার দেশপ্রেমের নানা সমালোচনাও তিনি করেছেন। মূলত তাঁর কাছে মানব কল্যাণই ছিল মুখ্য। আজ ভারতের স্বাধীনতার ৭৮ বছর পর আমরা বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সম্পর্কিত ভাবনা চিন্তা দেশ গড়ার ক্ষেত্রে উপেক্ষিতই থেকেছে, প্রতিদিন ধ্বংস করার চেষ্টা চলছে বহুত্ববাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে, যা তাঁর স্বদেশ চিন্তার অন্যতম দিক। এ প্রসঙ্গে গৌরকিশোর ঘোষ এর মন্তব্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁর মতে, " রবীন্দ্রনাথ ভারতকে নেশন হিসেবে স্বীকার করেননি, তিনি বলেছিলেন ভারততীর্থ। তিনি দেখেছিলেন, ভারতকে নেশনের আঁটসাট অনেকে পরিধির মধ্যে ফেলা যায় না। ভারতের সাধনা সমন্বিত সংস্কৃতির সাধনা। ভারত এক জাতি নয়, বহু জাতির মিলন ক্ষেত্র। এই কথাটি সেকুলার গণতন্ত্রবাদীদের সর্বদা মনে রাখতে হবে।"[৩২] অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা নিয়ে আজ আর আমাদের কোন কাজ নেই। এ প্রসঙ্গে অনুরাধা রায় এর মতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি, "রবীন্দ্রনাথ যদি আজকের দিনের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর কাজে না-ও লাগেন, আমার মতো অসংখ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁর স্বদেশ চিন্তা কিন্তু আজও বেশ প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হয়। সেটা তাঁর স্বদেশ চিন্তায় নিহিত মূল্যবোধগুলির জন্য...– আত্মশক্তি, মানুষ বাঁধা ও মুক্তি।"[৩৩]

তথ্যসূত্র:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত। কালান্তর। রবীন্দ্র রচনাবলী (এয়োদশ খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৭১৩-৭১৪।

২. নিয়োগী, গৌতম। রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম। অভিযান পাবলিশার্স, ২০১৯, পৃ. ২৯৫।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ন্যাশনল ফন্ড। সমাজ। Tagore Web, https://tagoreweb.in/Essays/samaj-72/national-fund-5965। প্রবেশের তারিখঃ ৮ মার্চ ২০২৬।

৪. Mukherjee, Subrata. The Political Ideas of Rabindranath Tagore. Rupa Publications, 2020, p. 32.

৫. Sarkar, Sumit. The Swadeshi Movement in Bengal. Permanent Black, 2020, p. 43.

৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার, সম্পাদনা। গান্ধী পরিক্রমা। গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয়, ২০২০ পৃ. ২৮২।

৭. তদেব, পৃ. ২৮৪।

৮. তদেব, পৃ. ২৮২।

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্যের আহ্বান। কালান্তর। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪১-৬৪২।

১০. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, সম্পাদনা। ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তা পরিচয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩ পৃ. ২০২.

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ভারতবর্ষীয় সমাজ। আত্মশক্তি। ১৯৯০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১।

১২. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। প্রজা ও তন্ত্র। অনুষ্টুপ, ২০২১, পৃ. ৮৬।

১৩.ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। সত্যের আহ্বান। কালান্তর। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৮।

১৪. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭।
১৫. রায়, অনুরাধা। ইতিহাসের হরেক গেরো। অনুষ্টুপ, ২০১৯, পৃ. ২৬২।
১৬. তদেব
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ-বিরোধী স্বদেশপ্রেম। সেতু প্রকাশনী, ২০১২, পৃ. ৩৩।
১৮.মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার, সম্পাদনা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪।
১৯. তদেব, পৃ. ২০৫।
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। জাতীয়তাবাদ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১২, পৃ. ৭০।
২১. তদেব, পৃ. ৯০।
২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪।
২৩. মুখোপাধ্যায়, অশোক কুমার সম্পাদনা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫ -২০৬।
২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। গোরা। রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৫ পৃ. – ৯২৪।
২৫. নন্দী, আশিষ। জাতীয়তাবাদ ও ভারতচিন্তা। বুক পোস্ট পাবলিকেশন, ২০২০, পৃ. ২১।
২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।
২৭. তদেব, পৃ. ৮২-৮৩।
২৮. সেন, অমর্ত্য। তর্কপ্রিয় ভারতীয়। আনন্দ পাবলিশার্স, ২০২১ পৃ. ১০৫।
২৯. তদেব।
৩০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। স্বদেশী সমাজ। আত্মশক্তি। রবীন্দ্র রচনাবলী (এয়োদশ খন্ড)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৯০, পৃ. ৫৮।
৩১. ঠাকুর,রবীন্দ্রনাথ। ত্যাগ। শান্তিনিকেতন। Tagore Web, https://tagoreweb.in/Essays/shantiniketan-86/tyag-675। প্রবেশের তারিখঃ ১০ মার্চ ২০২৬।
৩২.. অধিকারী, রণজিৎ, সম্পাদনা। পূর্ব, সপ্তদশবর্ষ সংখ্যা ১ম ও ২য়, ২০২১, পৃ. ৪৪৭।
৩৩. রায়, অনুরাধা। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮।